# বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা : সমস্যা ও সম্ভাবনা[১]

সুভাষ ভট্টাচার্য

ক

২০০২ সালে অবভাস পত্রিকার জানুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় সমাজবিজ্ঞানী প্রদীপ বসু একটি নিবন্ধ লেখেন। ওই নিবন্ধে তিনি বাংলা ভাষার প্রয়োগকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। একটি সাহিত্যের ভাষা বা সাহিত্য রচনার ভাষা। অন্যটি জ্ঞানচর্চার ভাষা। তাঁর মতে ভাষার এই প্রথম প্রকোষ্ঠটি যথেষ্টই সমৃদ্ধ। কিন্তু জ্ঞানচর্চার অর্থাৎ দর্শন, সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির প্রকাশে বাংলা ভাষা খুবই পিছিয়ে আছে। তিনি বেশ একটা চটুল কথাই বলে ফেলেছেন। বলেছেন, বাংলায় 'জ্ঞানচর্চার ভাষা লিকলিকে। ফলে ভাষা বলে যে বস্তুটা আছে সেটাকে সামান্য ল্যাঙ মারলেই উল্টে পড়ার সম্ভাবনা।'[২] আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তিনি বলেছেন, বাংলা ভাষার এই দুর্বলতার কারণ হল আমাদের চিন্তাচেতনার দৈন্য।

আমি শ্রীবসুর এই কথাটা দিয়েই আমার আজকের কথা শুরু করব। আমি অবশ্য জানি না, শ্রীপ্রদীপ বসু এখনও তাঁর ওই বক্তব্যে স্থিত আছেন কি না। কেননা, মাঝে মাঝেই দেখছি তিনি নিজেই সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক গম্ভীর নিবন্ধাদি লিখে চলেছেন, এবং তা ওই বাংলা ভাষাতেই। যাই হোক, আমি তাঁর ওই ২০০২-এর কথাটাতে ধরেই এগোতে চাই।

প্রদীপ বসুর কথাটায় আমি শিবনারায়ণ রায়ের কয়েক দশক আগের একটা মন্তব্যেরই প্রতিধ্বনি শুনছি যেন। শিবনারায়ণ রায়কে আমরা জানি এক মননশীল লেখক হিসেবে। সেই তিনি তাঁর 'মুখের ভাষা, লেখার ভাষা, মননের ভাষা' নামে এক নিবন্ধে কী বলেছেন দেখে নিই---'গত তিনশো বছরে ইংরেজি গদ্যসাহিত্যের ভাষা যে শক্তি অর্জন করেছে, বাংলা সে তুলনায় অনেক দুর্বল রয়ে গেছে। দর্শন, সাহিত্যতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, বিবিধ জড় এবং জীবিত সম্পর্কিত বিজ্ঞান---কোনও ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার উল্লেখ্য স্বকীয়তাসম্পন্ন গ্রন্থ বড় একটা রচিত হয়নি।' আবার লিখছেন---'কথাসাহিত্যে

বাংলা ভাষা প্রভূত উৎকর্ষ অর্জন করলেও মননশীল সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা এখনও দুর্বল ও দরিদ্র।'[২]

এই বিষয়ের কোনো আলোচনায় যেতে হলে প্রবেশক হিসেবে নিজেদের একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে এবং সাধ্যমতো সন্ধান করতে হবে তার উত্তরও। তারপরই কেবল আমরা মূল আলোচনায় যেতে পারব। তবে তার আগে আমি বলি, আমি এই দুজনেরই বক্তব্য প্রতিবাদযোগ্য বলে মনে করি।

খ

প্রশ্নটা খুবই সহজ, উত্তর অবশ্য ততটা সহজ নয়। প্রশ্নটা হল---একটা ভাষার শক্তি ও প্রকাশক্ষমতা কী দিয়ে যাচাই করা হয়? আমার এবারকার আলোচনা বাংলা ভাষার সামর্থ্য নিয়ে, প্রকাশক্ষমতা নিয়ে। সেই প্রসঙ্গে যাবার আগে বলে নিতে চাই যে, 'ভাষার দৈন্য' কথাটা যতটা অর্থবহ, তার চাইতে 'ভাষাব্যবহারকারীর অক্ষমতা' কথাটাই বেশি অর্থবহ, বেশি সত্য। আর চিন্তাচেতনার দৈন্য কাদের? যাঁরা বিদ্যাচর্চা করেন, তাঁদের ততটা নয়, যতটা শিক্ষা-পাওয়া অশিক্ষিতদের, যাঁরা পথেঘাটে যানবাহনে অনর্গল ভুল কথা বলেন, যাঁরা পদে-পদে ব্যাকরণ আর বানান অকুতোভয়ে ভুল বলেন। এখানে তো আমরা বিদ্যামনস্ক মানুষজনের কথা বলছি, যাঁদের সংখ্যা চিরকালই কম।

এবার আমাদের মূল আলোচনায় যাই।

একটা ভাষার প্রকাশক্ষমতা কী দিয়ে যাচাই করা যায়? কীসে বোঝা যায়? এই প্রশ্নটা তুলেছি একটু আগে। উত্তরে বলি---অনেককিছু দিয়েই যাচাই করা যায়, অনেককিছুতেই বোঝা যায়। সেই অনেককিছুর একটা হল ভাষার শব্দসমৃদ্ধি, যাকে richness of vocabulary বলতে পারি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পৃথিবীর ভাষাগুলোকে দু-ভাগে ভাগ করেছিলেন একসময়---আত্মনিষ্ঠ ও গঠনশীল ভাষা এবং পরাশ্রয়ী ভাষা। আত্মনিষ্ঠ ও গঠনশীল ভাষাগুলো তাদের নিজেদের ধাতু-প্রত্যয়াদির সাহায্যে শব্দ তৈরি করতে পারে। কিন্তু পরাশ্রয়ী ভাষাকে প্রায়ই অন্য ভাষার উপর নির্ভর করতে হয়, অন্য ভাষা থেকে শব্দ ধার করতে হয়। তাঁর মতে ইংরেজি আর বাংলা এই দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষা। ইংরেজি গ্রিক-লাতিন-জার্মান সহ বহু ভাষার শব্দ আহরণ করে সমৃদ্ধ হয়েছে। বাংলাও তাই। সুনীতিকুমারের 'পরাশ্রয়ী' পরিভাষাটাতে আমাদের একটু সংশয় আছে। ওতে যেন মনে হয় এ-ভাষা সব ক্ষেত্রেই অন্য ভাষার আশ্রিত। পরিভাষায় আপত্তি থাকলেও ভাষাচার্যের মূল বক্তব্য নিয়ে কলহ করা অসম্ভব। সত্যিই তো, বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে সংস্কৃত তথা তৎসম শব্দ যেমন অজস্র আছে, তেমনি আছে সংস্কৃত থেকে বদলে-আসা তদ্‌ভব আর অর্ধতৎসম শব্দ। বহু বহু প্রাকৃত ভাষার শব্দও যে বাংলায় আছে তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যে। এ ছাড়া অস্ট্রিক ভাষার শব্দ, প্রতিবেশী ভাষার শব্দ, বিদেশি শব্দ আমরা নিয়েছি প্রভূত সংখ্যায়। অ্যাডমিড কার্ড, অ্যাটর্নি, অ্যান্টেনা, অ্যাফিডেভিট, আর্থ্রাইটিস---এই শব্দগুলোর কি বাংলা প্রতিশব্দ নেই? আছে, কিন্তু সেসব এতই দুরূহ এবং কখনো-কখনো এতই দুরুচ্চার যে আমরা সরাসরি ইংরেজি শব্দগুলোই ব্যবহার করি। এইভাবেই জাপানি শব্দ জুজুতসু, রিকশা, বনসাই আমরা অনায়াসে ব্যবহার

করছি, যেন এগুলো বাংলা শব্দই। আমরা কি মনে রাখি যে, 'মোরাম' (মোরাম বিছানো পথ) একটা তেলুগু শব্দ? ঝাঁটা, ঢেঁকি, ঢাক যে অস্ট্রিক ভাষার শব্দ, তাও কি খেয়াল করি আমরা? আর আরবি-ফারসি শব্দের তো কথাই নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষারই যদি ঋণে গৌরবহানি না হয়, তবে আমরাই-বা ঋণ করতে কুণ্ঠিত হব কেন?

একথা আজ আর সত্য নয় যে, শব্দসম্ভারে বাংলা ভাষা হীন বা দুর্বল। একশো বছর আগে যে দুর্বলতা ছিল--- যদি কিছু থেকেও থাকে---আজ আর তা নেই। আমি এখানে আরও একটা কথা বলতে চাই। যত দিন যায়, যেকোনো প্রমিত ভাষাতেই মুখের ভাষার প্রভাব পড়ে। খুবই স্বাভাবিক তা। কিছু কিছু ঔপভাষিক শব্দও আমরা প্রমিত ভাষায় বা মান্য ভাষায় ব্যবহার করতে পারি। যেমন ধরুন, 'কমা' শব্দটা। রাঢ় অঞ্চলের অতিপ্রচলিত বিশেষণ। এর অর্থ নিম্ন মানের, Substandard ভাবুন এর বিকল্প শব্দ কী কী হতে পারে? নিকৃষ্ট, অনুৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট ইত্যাদি। কোনোটাই কি ওই 'কমা'-র অর্থ ঠিক ঠিক বহন করে? এইরকম অতি ভাবপ্রকাশক শব্দ যদি উপভাষা থেকে নেওয়া হয় তাতে আমাদের শব্দসম্ভার আরওই সমৃদ্ধ হতে পারবে।

আর একটা কথাও বলা দরকার। আমাদের ভাষায় অন্য যেকোনো উন্নত ভাষার মতো নতুন শব্দ ক্রমাগত আসছে, নতুন শব্দ তৈরি হচ্ছে। কোনো শব্দ কবি-সাহিত্যিকেরা তৈরি করছেন, কোনো শব্দ প্রচলিত করছে সংবাদপত্র। ভেবে দেখুন দ্বিরালাপ (dialogue), মধ্যমেধা, সূচনাবিন্দু, প্রস্থানবিন্দু, স্বতশ্চল, শুভনাস্তিক্য (cynicism), তত্ত্ববিশ্ব, (কবিতার) ভাষাবিশ্ব---এই শব্দগুলো আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগে জানা ছিল না। জানতাম কি 'কেপমার' বলে কোনো শব্দ? আশির দশকে প্রথম ব্যবহার দেখেছি উড়ালপুল (flyover ) শব্দটার, তার কিছু পরে এল উড়ান (flight)। আজ তো এসব শব্দ কত স্বাভাবিক আর একেবারে হাতের কাছের শব্দ, যাকে বলে ready to hand। একথা বলছি না যে, সব শব্দই সুরচিত। কিন্তু শব্দ তো পাচ্ছি, শব্দ তো বাড়ছে ভাষায়। বড়ো কথা সেটাই।

কোনো ভাষার শক্তি বা সামর্থ্যের ইশারা পাওয়া যায় তার শব্দগঠনের ক্ষমতায়। শব্দগঠনের দিক দিয়ে বাংলা দুর্বল এমন একটা অভিযোগ শুনতে হয় প্রায়ই। শব্দগঠন প্রকিয়া হল morphology বা রূপতত্ত্বের এলাকাভুক্ত বিষয়। আমরা দেখে নিতে পারি বাংলায় শব্দগঠন কীভাবে হয়, বা হতে পারে। একথা আপনাদের অজানা নয়, যে, পৃথিবীর তাবৎ ভাষাগুলোর মধ্যে শব্দগঠনের সম্ভাবনা বা শক্তির দিক থেকে সংস্কৃত এগিয়ে আছে অন্য প্রায় সব ভাষার চাইতে। আমরা নিশ্চয় এমন দাবি করব না যে, বাংলাও একই কৃতিত্বের দাবিদার। তবে বাংলায়ও যে নতুন নতুন শব্দ গঠন করার উপায় আছে এই কথাটাও বুঝে নেওয়া দরকার।

এইখানে এসে অনেকেরই নিশ্চয় মনে পড়বে রবীন্দ্রনাথের একটা কথা, যা তিনি বলেছিলেন 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইয়ে। তাঁর কথাটা ছিল এই---'বাংলা ভাষার আপন রীতিতে নতুন শব্দ বানানো প্রায় অসাধ্য'।[৩] যাঁরা শব্দগঠনে বাংলার দুর্বলতার কথা বলেন, তাঁরা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের এই বাক্যটিকেই প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাটা ওখানেই শেষ হয়ে যায়নি। তিনি বলেছিলেন যে, বাংলার নিজস্ব নিয়মে শব্দগঠনের ক্ষমতা সীমিত। তাই আমাদের সংস্কৃতের দ্বারস্থ হতেই হয়।[৪] আর একথা কে না জানে যে, সংস্কৃতের নিয়মই এখন বাংলারও নিয়ম। বাংলার নিজস্ব নিয়ম সীমিত বটে, তবে বাংলার আর সংস্কৃতের নিয়ম মিলিয়েই চলে শব্দ বানানোর খেলাটা।

শব্দ তৈরি করার নানান প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমেই মনে পড়বে সমাসের কথা। সমাসের ব্যাকরণগত খুঁটিনাটির কথা মোটেই বলতে চাই না এখানে। সেসব সবারই জানা। আমি কেবল এই কথাই বলতে চাই যে দুটো বা তার বেশি শব্দ জুড়ে জুড়ে নতুন শব্দ বানাবার এই প্রক্রিয়া বাংলায় চলে আসছে বহুকাল ধরেই। সন্দেহ নেই যে, এই প্রক্রিয়ায় আমরা সংস্কৃতেরই হাত ধরি বেশি। সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করার ব্যাপারে নানাভাবে নতুনত্ব সৃষ্টিও করা হয়। শঙ্খ ঘোষ যখন লেখেন প্রহারচিহ্ন বা আত্মসামর্থ্য, তখন বুঝতে হবে যে, এ হল উদ্‌ভাবন। কোনো অভিধানে এমন শব্দ নেই। আমরা নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতেই পারি। 'দ্বিধাদীর্ণ' কথাটা সবারই জানা। এবার এরই অনুকরণে বানাতে পারি 'দ্বন্দ্বদীর্ণ' কথাটা। আমাদের শব্দকুশল লেখকেরা তো প্রতিনিয়ত এইরকম শব্দ তৈরি করছেন। বাংলার নিয়মেও যে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত 'তেলেবেগুনে', 'হাতাহাতি', 'গায়েহলুদ'।

শব্দের গোড়ায় উপসর্গ জুড়ে আর শেষে প্রত্যয় জুড়েও নতুন শব্দ তৈরি হয়। এও তো কিছু নতুন নয়। এই প্রক্রিয়ায় সংস্কৃতের সাহায্য যেমন নিই, তেমনিই বাংলা ভাষার নিয়মেও শব্দ তৈরি করি। বিদেশি ভাষার সাহায্যও নিয়ে থাকি। প্রতিবাদ, অনুকৃতি, অবসাদ, পরাক্রম; অতিপ্রজতা, সত্যতা---এগুলো সংস্কৃত মতে তৈরি শব্দ। অনাসৃষ্টি, নিখরচা, বিদেশ-বিভুঁই, ভরদুপুর---এগুলো বাংলা উপসর্গের দৃষ্টান্ত। আবার আমদরবার, গরমিল, খাসমহল, নিমরাজি বিদেশি উপসর্গ। দুই ভাষার শব্দাংশ মিশিয়েও শব্দ তৈরি হয়---হেডপণ্ডিত, ফুলহাতা, হাফপাঞ্জাবি। প্রযোজক দিয়েও নতুন শব্দ বানাই আমরা। অনুকার শব্দ দিয়েও নতুন শব্দ তৈরি করি---খেলাটেলা, ছেঁড়াখোঁড়া, জলটল। কেবল একটা ধ্বনি যোগ করে কিংবা ধ্বনি বদল করে নতুন শব্দ তৈরি হতে পারে, হয়ে থাকে---স্কুল থেকে ইস্কুল, প্রমাদ থেকে পরমাদ, শ্রী থেকে ছিরি। একথা ভুললে চলবে না যে, স্কুল যে অর্থ বহন করে, তা থেকে ইস্কুল আলাদা, শ্রী-র প্রয়োগক্ষেত্র আর ছিরি-র প্রয়োগক্ষেত্র এক নয়।

ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে ভাষাকে ব্যবহার করার অনেকরকম উপায় বা প্রক্রিয়া আছে। তার মধ্যে একটা হল বিশেষ্যকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা আর বিশেষণকে বিশেষ্য হিসেবে। দু-একটা উদাহরণ দিই---বন্যেরা বনে সুন্দর। এইভাবে ব্যাকরণের নিয়মের হেরফের করে বিশেষণ বন্য-কে বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করলাম। 'বন্য প্রাণীরা' এই শব্দযুগলকে অনায়াসে একটা 'বন্য' শব্দে আনা গেল। এমন দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যায়---সাদাদের দম্ভ, কালোদের অভ্যেস। এর উলটো প্রক্রিয়া হল বিশেষ্যকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করা---বাজার অর্থনীতি, লোকচলাচল, সাহিত্যসভা, উদ্বাস্তু শিবির। এর প্রত্যেকটাতে প্রথম অংশটা বিশেষ্য, কিন্তু ব্যবহৃত হল বিশেষণ হিসেবে। আমরা প্রতিনিয়তই এমন শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করি। কেবল খেয়াল রাখি না যে, এগুলোতে বিশেষ্য-বিশেষণের মধ্যে একটা স্থান-বিনিময় চলছে।

এবার খুব ছোটো করে একটা ভাষাতত্ত্বের প্রসঙ্গ আনব। সংস্কৃতকে বলা হয় শ্লাদ্রষ্ঠত্রষ্ঠত্ব বা সংশ্লেষাত্মক ভাষা। এই ধরনের ভাষায় বিভক্তির গুরুত্ব খুবই বেশি, আর সেইজন্য পদের কোনো নির্দিষ্ট ক্রম নেই। তার মানে সংস্কৃতে পদক্রমের গুরুত্ব নেই। পদগুলোকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাজানো যায়।

অহং চন্দ্রং পশ্যামি।

এই বাক্যকে অহং পশ্যামি চন্দ্রম্ বলতে পারি। আবার পশ্যামি অহং চন্দ্রম্-ও বলতে পারি।

অন্য দিকে বাংলাকে বলা হয় analytic বা বিশ্লেষাত্মক ভাষা। বাংলায় বিভক্তির গুরুত্ব ততটা নয়। তাই পদক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমি মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি।

এই বাক্যকে আমি যাচ্ছি স্কুলে মেয়েকে নিয়ে বা মেয়েকে আমি যাচ্ছি স্কুলে নিয়ে---বললে বাংলার পক্ষে তাকে স্বাভাবিক বলা যাবে না।

কিন্তু সময় যত এগোচ্ছে ততই দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষা সংশ্লেষাত্মক বৈশিষ্ট্যও কিছু কিছু অর্জন করছে। এখন বলা হয় যে, বাংলায় সংশ্লেষাত্মক আর বিশ্লেষাত্মক এই দুই রীতিরই মিশেল ঘটছে।[৫] এখন দরকারমতো পদক্রমের হেরফের ঘটানো হয় বাংলায়ও, শুধু কবিতায় নয়, গদ্যেও। ভাষায় বৈচিত্রসাধনের জন্যে কখনো-কখনো ব্যাকরণের অনুশাসনের বাইরেও যাই আমরা। যেমন ক্রিয়াপদের ঊহ্যতা। প্রায়ই দেখতে পাই, ক্রিয়াপদকে ঊহ্য রাখলে বাক্যে দৃঢ়তাসঞ্চার হয়। অনেক বছর আগে প্রেমেন্দ্র মিত্র কী লিখেছিলেন দেখি একবার---

> 'পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ইতিহাস-চিহ্নিত বিশ্ববিশ্রুত পুরুষ। ভারতবর্ষের মুক্তিসাধনায় অগ্রগণ্য তাঁর ভূমিকা, স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে তিনি আজন্ম কর্ণধার ও স্থপতি, সারা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তাদের মধ্যে সম্মানিত তাঁর আসন'।[৬]

এই বাক্যে দেখুন একটিও ক্রিয়াপদ দৃশ্যমান নয়। আমরা বলি, বাংলা ভাষায় মোটেই অস্বাভাবিক নয় এটা। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে চলে আসছে এভাবে বাক্যে ক্রিয়াপদকে ঊহ্য রাখা। বাক্য এতে সবল হয়, এলিয়ে পড়ে না।

অনেকেই বলেন, বিজ্ঞানের আলোচনায় অসুবিধের একটা বড়ো কারণ পরিভাষার স্বল্পতা বা অপ্রতুলতা। কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ে চর্চার সময় পরিভাষার প্রয়োজন খুবই অনুভব করি আমরা। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে, বিজ্ঞানের বহু শাখাতেই পরিভাষা তৈরি হয়ে আছে। আর তৈরি হচ্ছেও। আপনাদের নিশ্চয় মনে পড়বে ১৯৩৬-৩৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার সমিতি একটি পরিভাষা-সংকলন প্রস্তুত করেছিল। তার অনেকগুলোই রাজশেখর বসু তাঁর 'চলন্তিকা'-র শেষে রেখেছেন। আপনাদের আরও জানাই সাহিত্য সংসদ বেশ কয়েকবছর আগে গোলকেন্দু ঘোষের সম্পাদিত বিজ্ঞান পরিভাষা কোষ প্রকাশ করেছে, ওই সংস্থা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে জীববিজ্ঞান কোষ আর ভূবিজ্ঞান কোষ। তাতেও আছে প্রচুর পরিভাষা। এমনকী, মনোবিদ্যার পরিভাষা, মনোরোগবিদ্যার পরিভাষাও আছে, আছে অস্বভাবী মনোরোগবিদ্যার পরিভাষা। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশ করেছে ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষারও অভাব নেই। তবু কি সব পরিভাষা তৈরি হয়ে গেছে? নিশ্চয় হয়নি তা। বিশেষত নতুন যেসব বিদ্যা পাশ্চাত্য জগৎ থেকে এদেশে সম্প্রতি প্রচলিত হয়েছে, সেসবের পরিভাষা এখনও হয়নি। এই ঘাটতি মেনে নিয়েই একটা কথা বলব। বিজ্ঞানে যথেষ্ট পরিভাষা নেই, এ নিয়ে যখন কেউ-কেউ আক্ষেপ করছিলেন, তখন বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন, পরিভাষার অভাব কোনো অজুহাত হতে পারে না। যেসব শব্দের পরিভাষা রচিত হয়নি সেগুলো বাংলা হরফেই লেখা যেতে পারে। যাঁরা বলেন, পরিভাষার

অভাবে বিজ্ঞানচর্চা করা যাচ্ছে না, তাঁরা হয় বিজ্ঞান জানেন না, নয়তো ভাষাটাই জানেন না। প্রায় একই কথা বলেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং দর্শনের বিশিষ্ট অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস।

পাশ্চাত্য জগৎ থেকে যেসব বিষয় গত কয়েক দশকে এদেশে এসেছে, যেমন semiotics বা semiology, সেগুলোর পরিভাষা-রচনা এখনও পুরোপুরি হয়নি, একথা ঠিক। তবু কয়েকজন গবেষক-লেখক নিয়মিত সেসবের চর্চা যে সার্থকভাবেই করে চলেছেন, সেকথা পরে বলব। কেবল একটা অনুযোগের কথা এখানে জানাতে চাই। কয়েক বছর আগে সুধীর চক্রবর্তী তাঁর বিশিষ্ট পত্রিকা 'ধ্রুবপদ'-এর জন্যে অনেক লেখক ও বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে শতাধিক বিষয়ে লেখা আহ্বান করেন। সেটি পরে 'বুদ্ধিজীবীর নোটবই'[৭] নামে প্রকাশিত হয়। সুধীরবাবুর প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কিন্তু ও-বইয়ে অধিকাংশ লেখকই বিষয়কে ঠিকমতো না-বুঝে লিখেছেন, বিদেশি বইপত্র থেকে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে অনুবাদ করেছেন। ফলে অধিকাংশের কাছ থেকেই উৎকৃষ্ট লেখা পাওয়া যায়নি। যান্ত্রিক অনুবাদ তো আছেই, বিদেশি নামের ভুল প্রতিবর্ণীকরণ পাতায় পাতায়। এমনকী, শব্দ লিখতেও ভুল করেছেন অনেকে। অথচ ওই বইয়েই তো আছে সুকান্ত চৌধুরী, দীপেন্দু চক্রবর্তী, পবিত্র সরকারের মতো লেখকদের নিবন্ধ যা শুধু স্বচ্ছই নয়, আকর্ষক ও উদ্দীপকও বটে। একথা বিশ্বাস্য নয়, যে, বিষয়টাকে ঠিক ঠিক বুঝে নিলে স্বচ্ছ ও স্বাদু বাংলায় তাকে প্রকাশ করা যায় না।

তবে দু-একটা শর্ত অবশ্যই আছে। আমরা লক্ষ করেছি, একালের কয়েকজন লেখক-বুদ্ধিজীবী যে ভাষা-ভঙ্গিতে লেখেন তা অধিকাংশ শিক্ষিত ও শিক্ষামনস্ক পাঠকেরও অবোধ্য থেকে যায়। বারবার পড়েও অনেকসময় সেসব লেখার মর্মোদ্ধার করা যায় না। লক্ষ্য যদি হয় সুষ্ঠু জ্ঞাপন, তাহলে এ-ধরনের রচনা নিশ্চিতভাবেই ব্যর্থ। যদি উদ্দেশ্য হয় দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যের প্রদর্শন তাহলে তাকে সফল বলা গেলেও যেতে পারে। একালের এক বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী আমাকে বলেছিলেন, একটি সাময়িকপত্রে প্রকাশিত একটি নিবন্ধ তিনি দু-বার পড়েও তার মর্মোদ্ধার করতে পারেননি। জানি না এ কেমন বিদ্যাচর্চা। দ্বিতীয় একটা কথাও আছে। লেখককে শব্দের সঠিক প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে। ভুল উচ্চারণ এবং ভুল অর্থ প্রয়োগ বাক্যকে ধূলিসাৎ করে। একজন বুদ্ধিজীবী একটি নিবন্ধে একটি ফরাসি শব্দকে লিখেছেন এক্রিট্স (ecrits)। শব্দটির প্রকৃত উচ্চারণ এক্রি, অর্থ written statement বা লিখিত বয়ান। ওই লেখকই এলিয়েনেশনকে লেখেন অ্যালিয়েনেশন। একালের কিছু রচনায় দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যের প্রগল্‌ভ প্রদর্শন যত থাকে, প্রকৃত বিদ্যার উদ্‌ভাস তত দেখি না।

ভরসার কথা এই যে, এটাই সামগ্রিক চিত্র নয়। এই আলোচনার পরের পর্বে আমরা দেখব, বাংলায় বিদ্যাচর্চার সার্থক নমুনা কম নয়, বরং রীতিমতো আশাপ্রদ।

গ

শেষ পর্বের আলোচনায় যাবার আগে, অর্থাৎ বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার সার্থক নুমনার দিকে চোখ রাখার আগে বাংলা গদ্যভঙ্গি নিয়ে দু-চারটি কথা একটু বলে নিলে ভালো হয়। আমরা কথাসাহিত্যিক এই আলোচনার বাইরে রেখেছি। সংগত কারণেই রাখা হয়েছে তা। কিন্তু

বিদ্যার অন্য সব শাখাতেই কি একই গদ্যভঙ্গির ব্যবহার হয়? হতে পারে? নিশ্চয়, তা হয় না। রবীন্দ্রনাথ ওই 'বাংলাভাষা-পরিচয়' বইয়েই বলেছেন---''মানুষের বুদ্ধিসাধনার ভাষা আপন পূর্ণতা দেখিয়েছে দর্শনে বিজ্ঞানে। .....জ্ঞানের ভাষা যতদূর সম্ভব পরিষ্কার হওয়া চাই; তাতে ঠিক কথাটার ঠিক মানে থাকা দরকার, সাজসজ্জার বাহুল্যে সে যেন আচ্ছন্ন না হয়। জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ।'' আমরা একটু অন্যভাবে বলতে পারি, দর্শনে-বিজ্ঞানে বা বিজ্ঞানশ্রয়ী বিদ্যায় দরকার ঋজু গদ্য, যে-গদ্য দ্ব্যর্থহীন, নির্ভার, নির্মেদ। যেমন গদ্য লিখেছেন রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রাজশেখর বসু।

এখানে আরো একটা কথা বলার আছে। কথাসাহিত্যকে বাদ দিলে গদ্যের রূপরীতি অনেকটাই হবে বিষয়ভিত্তিক। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন---''ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে, যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা ও সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।''[৮]

বিষয়ের গুরুত্বকে অস্বীকার না ক'রেও একটা কথা বলা যেতে পারে। জ্ঞানচর্চা বা বিদ্যাচর্চা মানে নিশ্চয় কেবল দর্শন আর বিজ্ঞানের চর্চা নয়। আমাদের বিবেচনায় আসবে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদিও। কাজেই গদ্যের একাধিক স্টাইল বা রীতি অনুসৃত হতেই পারে। হওয়াই স্বাভাবিক তা। এ বিষয়ে প্রায় চল্লিশ বছর আগে বাংলা গদ্যের রীতি সংক্রান্ত আলোচনায় পবিত্র সরকার যা বলেছিলেন তা খুবই প্রাসঙ্গিক এ ক্ষেত্রে। তিনি বলেছিলেন, এমন কোনো কোনো বিষয় আছে যাকে দ্রব্রব্জ্ঞঁথ৩ বা নিরপেক্ষ বিষয় বলা যায়---যেগুলোর ক্ষেত্রে একাধিক বিকল্প স্টাইল অবলম্বনের সুযোগ আছে, অর্থাৎ গুরুগম্ভীর রীতি, অত্যন্ত সংস্কৃতঘেঁষা রীতি, মাঝারি রীতি, একেবারে সহজ সরল 'মাটির কাছাকাছি রীতি'; আবার এদের মধ্যবর্তী বহু সম্ভাবনাও থাকে। এর ভিতর থেকে যেকোনো একটিকে বেছে নেওয়া চলে। কোন রীতি নেওয়া হবে তা নির্ভর করবে লেখকের 'উদ্দেশ্যে'-র উপর। এখানে রীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে 'উদ্দেশ্য'।[৯] কথাটা যে সত্যি, তা বোঝা যায় দুজন বিশিষ্ট লেখকের গদ্যভঙ্গি লক্ষ করলে। এঁরা হলেন দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী আর ভাষাবিজ্ঞানী প্রবাল দাশগুপ্ত। অরিন্দম চক্রবর্তী 'মননের মধু' বা 'ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস' এসব বইয়ে একটা আপাতচটুল বা লঘু স্টাইল ব্যবহার করেছেন। তাঁর গম্ভীর দার্শনিক গ্রন্থের নামগুলোও লক্ষ করবার মতো। আসলে গম্ভীর বিষয়কে তিনি সহজসরল ভঙ্গিতে তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকদের কাছে পৌঁছে দিতে চান। তাই এই লঘু ভঙ্গি। একই কথা বলব ভাষাবিজ্ঞানী প্রবাল দাশগুপ্ত সম্বন্ধে তিনিও তাঁর 'কথার ক্রিয়াকর্ম', 'ভাষার বিন্দুবিসর্গ', 'ছিন্ন কথায় সাজায়ে তরণী' ইত্যাদি বইয়ে একটা হালকা ও আপাতলঘু স্টাইল ব্যবহার করেছেন। নিশ্চয় একই উদ্দেশ্যে। মনে হয় এতে পাঠকের সঙ্গে সহজে সংযোগ স্থাপন করা যায়। এঁদের এই লঘু গদ্যভঙ্গির আড়ালে রয়েছে গম্ভীর বিষয় আর গভীর চিন্তা।

গদ্যের নানান স্টাইলের প্রসঙ্গে 'গুরুচণ্ডালি'-র কথাটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে। সচরাচর গুরুচণ্ডালি বলতে সাধুভাষার ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সঙ্গে চলিতের ক্রিয়াপদ আর সর্বনামের মিশেলকেই বোঝায়। কিন্তু প্রসারিত অর্থে গুরুচণ্ডালি হল দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির মিশেল। তৎসম শব্দের পাশাপাশি দেশজ বা কথ্য রীতির শব্দ বসিয়ে গদ্যে গতি সঞ্চার করা যায়। তার প্রমাণ বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসুর গদ্য। তথাকথিত এই গুরুচণ্ডালি ঘটিয়ে গদ্যে প্রসাদগুণ সঞ্চার করার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হীরন্দ্রেনাথ দত্ত। তিনি লিখেছেন, ''বঙ্কিমের বহুনিন্দিত

গুরুচণ্ডালি দোষ সংস্কৃতের বাঁধনকে একটু ঢিলে করে দিয়েছিল।"[১০] আরো আগে একই কাজ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। 'কথামালা'-র এক গল্পে তিনি অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন---"এক দুঃখী নদীর তীরে গাছ কাটিতেছিল। হঠাৎ কুঠারখানি তাহার হাত হইতে ফস্কিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল"।[১১]

বাংলা গদ্য এই একুশ শতকে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে, উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। অরুণ মিত্রের লেখাতেই পড়েছি, অমন যে ফরাসি ভাষা তার সম্পর্কে খোদ ফরাসিদেরই একসময় কী ভুল ধারণা ছিল। কেউ কেউ মনে করতেন যে, ফরাসি গদ্য কেবল সৃজনশীল সাহিত্য রচনারই বাহন হতে পারে, অর্থাৎ সে-গদ্যে গল্প-উপন্যাসই রচিত হতে পারে, ওই গদ্য জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার উপযোগী নয়। কথাটা যে সবৈব ভুল তার প্রমাণ ফরাসি বিজ্ঞানীদের রচনা, ফরাসি দার্শনিকদের রচনা। তাঁরা তো ফরাসি ছেড়ে দলে দলে ইংরেজি বা জার্মানে লেখেননি।[১২]

ঘ

আজকের আলোচ্য বিষয় নিয়ে এতক্ষণ যা বললাম তাকে প্রাক্‌কথন বা ভূমিকা বলতে পারি, আর বলাই বাহুল্য, ভূমিকাটা বেশ-একটু দীর্ঘই হয়ে গেল। এবার আমি আপনাদের বলব সেইসব লেখক-গবেষকের কথা যাঁরা সার্থকভাবে বাংলা ভাষায় বিদ্যাচর্চার নজির গড়েছেন। আমি একে একে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে চর্চার নমুনাগুলো উপস্থিত করব আপনাদের সামনে। প্রথমেই বলব বাংলা ভাষার দর্শনচর্চার কথা। কেবল কৈফিয়ত হিসেবে বলে নিতে চাই যে, সব লেখকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব হবে না। এই খামতিটুকু আপনাদের মেনে নিতে বলব। এই ত্রুটির জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি।

## বাংলা ভাষায় দর্শনচর্চা

দর্শনচর্চার কথা বলতে গিয়ে আমি খুব বেশিদূর পিছিয়ে যেতে চাই না। আমি বিংশ-একবিংশ শতকের কথাই বলতে চাই। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বা সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কথা বেশি তুলব না, কেননা তাঁরা প্রধানত ইংরেজিতেই লিখেছেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অবশ্য 'সৌন্দর্যতত্ত্ব' নামে একটি অসামান্য পুস্তক বাংলাতেই রচনা করেছেন। তবু বলব এঁরা বাংলায় কমই লিখেছেন। যিনি উনিশ শতকের একেবারে শেষ থেকে বিংশ শতকের প্রথম পাদ অবধি বাংলাতেই লিখেছেন তাঁকে দিয়েই শুরু করি। তিনি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁর 'জিজ্ঞাসা' বইটি সুগভীর চিন্তায় ঠাসা। ওই বইয়ের 'সত্য', 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', 'আত্মার অবিনাশিতা' প্রভৃতি রচনায় যে নতুন চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে, তা হয়তো নয়। তবে তাঁর চিন্তার গভীরতা ভেবে দেখার মতো। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন---'নূতন কথা বলাই চিন্তার গভীরতার প্রমাণ নহে,

জ্ঞাতব্য বিষয়কে সব দিক্ হইতে দেখা এবং তলাইয়া দেখাই মনীষার তথা চিন্তার গভীরতার পরিচায়ক। দার্শনিকের নিকটে এই 'দর্শন'-ই প্রত্যাশা করা হয়।'[১৩] রামেন্দ্রসুন্দরের লেখায় দর্শন ও বিজ্ঞানের সার্থক সমন্বয় দেখা গেছে।

এবারে একালের এমন কয়েকজন কৃতী দার্শনিকের কথা বলব যাঁরা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায়ও রচনা করেছেন উৎকৃষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ ও সন্দর্ভ। প্রথমজন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯১৮-৯৩)। তাঁর 'লোকায়ত দর্শন', 'ভাববাদ খণ্ডন' আর 'ভারতীয় দর্শন' তিনটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। বাংলায় দর্শনচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেছিলেন---ইউরোপে দর্শনের ইতিহাস যে-ভাবে রচিত হয় বা হয়েছে, সেভাবে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনার প্রচেষ্টা অসম্ভব। পাশ্চাত্যে প্রাচীন কাল থেকে একের পর এক দার্শনিকের আর্বিভাব ঘটেছে এবং দর্শন প্রসঙ্গ তাঁরা স্বাধীন চিন্তা ব্যক্ত করেছেন। ভারতে প্রাচীন কাল থেকে নানা সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী তাদের দার্শনিক মত প্রকাশ করেছে। দার্শনিকের আবির্ভাব অবশ্যই হয়েছে, তবে তাঁরা নিজস্ব মত বা তত্ত্ব উপস্থিত না ক'রে গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের মতই প্রকাশ করেছেন---ফলে বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন যতটা মাথা তুলেছে, ব্যক্তি-দার্শনিকের ততটা আত্মপ্রকাশ দেখা যায় না। ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল---যেমন চার্বাক। দেবীপ্রসাদ এই ধারাকে মনে রেখেই লিখেছেন তাঁর দর্শনগ্রন্থাদি। তাঁর যাবতীয় রচনার মধ্যে 'লোকায়ত দর্শন' আর 'ভারতীয় দর্শন' শ্রেষ্ঠ। লোকায়ত দর্শন বলতে নিরীশ্বরবাদী ও অধ্যাত্মবাদবিরোধী দর্শনকেই বোঝায়।

এবার যাঁর কথা বলব তিনি বিমলকৃষ্ণ মতিলাল। অক্সফোর্ডের এই অকালপ্রয়াত দার্শনিককে সর্বকালের অন্যতম সেরা বাঙালি দার্শনিক বলা হয় (১৯৩৫-৯১)। ইংরেজীতে তিনি লিখেছেন Ethics and Epics, Philosophy Culture and Religion, Mind Language and the World। এর পাশাপাশি তাঁর দুটি অসামান্য বাংলা বইয়ের কথা বলব---'নীতি যুক্তি ও ধর্ম' এবং 'আমি ও আমার মন'। তাঁর গভীর আলোচনায় উঠে এসেছে রামায়ণের গুরুত্ব ও শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব। তিনি হিন্দুধর্মের মর্মকথা ব্যাখ্যা করেছেন, রামায়ণ-মহাভারতে নৈতিক তত্ত্ব এবং কর্তব্য-অকর্তব্যের বিরোধের বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে আলোচনা আর সমালোচনাই নীতিধর্ম মীমাংসার জীবনস্রোত। 'আমি ও আমার মন' তাঁর আর একটি চমৎকার বই। ব্যক্তি ও ব্যক্তির মন কি একই বস্তু? দার্শনিক বলেন, এক বস্তু নয়। ওই মনেরই প্রসঙ্গে এসে পড়ে ন্যায়ের কথা, চার্বাকপন্থীদের কথা, বৌদ্ধ তত্ত্বের কথা। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতার ও সর্বপারংগমতার প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে যেন একটুখানি খোঁচাই দিয়েছেন তিনি। ঈশ্বর যদি সবই পারেন, তবে অসহায় মানুষগুলোকে দিয়ে এত অনৈতিক ও অনুচিত কাজ কেন করিয়ে নেন?

একালের আর এক বিশিষ্ট দার্শনিক অরিন্দম চক্রবর্তী। অরিন্দম বাংলায় লিখেছেন 'ভাতকাপড়ের ভাবনা এবং কয়েকটি আটপৌরে দার্শনিক প্রয়াস', 'মননের মধু', 'দেহ গেহ বন্ধুত্ব'। অরিন্দম চক্রবর্তীর পাণ্ডিত্য আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। তাঁর লেখাপত্র একটু-বা জটিল, দর্শনে অদীক্ষিত পাঠকের পক্ষে দুরধিগম্য মনে হতেই পারে। কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছেন দুরূহ দার্শনিক বিষয় নিয়ে দিব্যি লেখা যায় বাংলা ভাষায়। অরিন্দমের লেখার ভঙ্গিটায় অনেকসময় একটা আপাত-লঘুতা থাকে। কিন্তু ভঙ্গিটা রীতিমতো প্রতারক। লঘুতার আড়ালে

আছে সুগভীর চিন্তা। অস্তিত্ব-অনস্তিত্বই দেহ গেহ বন্ধুত্বের মূল বিষয়। দর্শন মানে যদি ধারণার বা চিন্তার বিশ্লেষণ হয়, অস্তিত্ব চেতনা জ্ঞান ইত্যাদির অনুসন্ধান হয়, তাহলে বলতেই হবে, অরিন্দমের দর্শনচর্চা আমাদের এক শ্রেষ্ঠ উপার্জন।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের ছাত্র অধ্যাপক রাসবিহারী দাসের 'কান্টের দর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে। কারও কারও মতে কান্টের দর্শন পাশ্চাত্য দর্শনের দর্পণ। একথা সত্য হোক বা না হোক, বাংলা ভাষায় কান্টের দর্শনকে দর্শনের ছাত্রশিক্ষক সবার কাছে সার্থকভাবে উপস্থিত করে এক অতি দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন অধ্যাপক রাসবিহারী দাস।

অধ্যাপক রমাপ্রসাদ দাস একালের এক বিশিষ্ট দার্শনিক। প্রধানত ঞ্ছভদ্রন্দ্রদ্রদ্মাতদ্ভ্র ৩খদ্রভ্ভখত্ত্ব বা ভাষার দর্শন তাঁর অভিনিবেশের বিষয়। 'শব্দজিজ্ঞাসা : শব্দের প্রকার ও প্রকৃতি', 'শব্দ ও শব্দার্থের দর্শন', 'কথার কর্ম ও অপকর্ম' এ-বিষয়ে তাঁর প্রধান রচনা। এ ছাড়া আছে 'সাংকেতিক যুক্তিবিজ্ঞান'। বাংলাদেশের দার্শনিক রমেন্দ্রনাথ ঘোষের চর্চার বিষয় অবভাসতত্ত্ব, শংকরের অদ্বৈত দর্শন ও মধ্যযুগের হিন্দু দর্শন। কলকাতার শেফালী মৈত্রের 'নৈতিকতা ও নারীবাদ' একটি বিশিষ্ট দর্শনগ্রন্থ। বাংলাদেশের আবদুর রশীদের কথাও বলা দরকার। ক্কহ্মন্ঠত্রদ্বদ্র৩দ্রদ্ভ নিয়ে তাঁর লেখা 'জ্ঞানতত্ত্ব' নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। কলকাতার দর্শনের অধ্যাপক শ্রাবন্তী ভৌমিক পাঁচজন ইয়োরোপীয় দার্শনিকের জীবনকথায় খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের জীবনদর্শন। তাঁর 'বেঁচে থাকার দর্শন' বইটি এই সময়ের একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। টেকনিক্যাল বিষয়ের আলোচনায় লেখকের অজান্তেই অধিভাষা বা দ্বত্রষ্ঠখ৩খদ্রভ্ভখত্ত্ব এসে যায়। শ্রাবন্তী ভৌমিক বা শেফালী মৈত্রের লেখায় অধিভাষা ভিন্ন চেহারায় দেখা দেয়। সে-ভাষা উৎসাহী পাঠকের নাগালের বাইরে যায় না।

একথা ভেবে আপ্লুত হই যে, বার্ট্রাণ্ড রাসেলের A History of Western Philosophy অনূদিত হয়েছে সুঠাম বাংলা গদ্যে। এর্ভিন শ্রয়ডিংগারের বিখ্যাত Mente y Materia (মেন্তে ই মতেরিয়া) বাংলায় অনূদিত হয়েছে 'মন ও জড়বস্তু' নামে। শ্রয়ডিংগার বিশ্বখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী বটে, তবে তাঁর এই বইটিতে বিজ্ঞান ও দর্শন ওতপ্রোত, একটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না অন্যটি থেকে। এই বইয়ের অনুবাদ এক অতি দুরূহ কর্ম। অনুবাদক সেই কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন।

পেশাগতভাবে দার্শনিক না হয়েও গভীর দর্শনচর্চার প্রমাণ দিয়েছেন দুজন---রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যাঁর 'চার্বাকচর্চা', 'বস্তুবাদ জিজ্ঞাসা' আর 'মননের মূর্তি' বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট দর্শনচর্চার নমুনা নিঃসন্দেহে। দ্বিতীয়জন সৌরীন ভট্টাচার্য। তাঁর ছোট্ট বই 'বিষাদের দর্শন'-এর বিষয় হল নৈরাশ্য, নেতি, দুঃখবাদ ইত্যাদি। দুজনের গদ্যই সাবলীল এবং প্রসাদগুণসম্পন্ন।

## বিষয় বিজ্ঞান

এবারে দেখব আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার নমুনা। সাম্প্রতিক কালে আমাদের ভাষায়

বিজ্ঞানচর্চার কথা বলার আগে একটু পিছিয়ে যেতে চাই। যাঁরা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে আক্রান্ত তাঁরা নিশ্চয় মনে রাখেন না, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অক্ষয়কুমার দত্ত ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনাবলির কথা। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'প্রাকৃত-ভূগোল' বইয়ে জল-স্থল-বৃষ্টি, সমুদ্র-নদ-নদী-পর্বত-উপত্যকা, ঋতুচক্র ইত্যাদির বিবরণ দেওয়া হয়েছিল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। প্রাকৃত ভূগোল মানে প্রাকৃতিক ভূগোল। একইভাবে বিশেষভাবে মনে রাখার মতো একটি বই লিখেছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর 'পদার্থবিদ্যা'য় ব্যাখ্যা করা হয়েছিল পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব ও তথ্য, যা প্রধানত আহৃত হয়েছিল পাশ্চাত্যের নানা বইপত্র থেকে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত এভাবেই হয়েছিল বলা যায়। এবং ওই সূত্রপাতকে কি হালকাভাবে নেওয়া উচিত?

আমরা মনেই রাখি না যে, ত্রিশের দশকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে যে বিজ্ঞান সমিতি বা Science Association গড়ে উঠেছিল, সেখানে ইংরেজি ও বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন হত। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা লেখা পড়তেন, বলতেন। আরও উল্লেখযোগ্য যে, রথীন্দ্রনাথ বাংলায় দু-তিনটি বই লিখে বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছিলেন বলা যায়। তাঁর লেখা 'প্রাণতত্ত্ব' (১৯৪০) আর 'অভিব্যক্তি' (১৯৪৫)-এর কথা ভুলে যাওয়া অমার্জনীয়।

কিন্তু আমরা লক্ষ করি, এখন পশ্চিমবঙ্গে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা করতে অনেক বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান আলোচকেরাই একটু-যেন অনীহা বা কুণ্ঠা রয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-লেখকদের সাধারণ প্রবণতা ইংরেজিতে লেখার দিকে। যাকে প্রোফেশানাল জার্নাল বলি তাতে পেপার লেখা তো খুবই ভালো কথা। কিন্তু বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চায় অনীহা কেন? এর একটা কারণ হতে পারে এই যে, লেখকেরা বাংলায় লিখতে অভ্যস্ত নন, হয়তো-বা সাহসী হন না সেই কারণে। তবে বাংলায় বিজ্ঞানের চর্চা অন্য বিষয়গুলোর তুলনায় একটু কম হলেও থেমে থাকেনি তা। অনেকেরই মনে পড়বে প্রায় ষাট বছর আগে সমরেন্দ্র সেনের লেখা 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' বইটির কথা। মনে পড়বে কয়েক দশক আগে লেখা অরূপরতন ভট্টাচার্যের 'প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান' বইটির কথা। কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, অমল দাশগুপ্তের 'মহাকাশের ঠিকানা' আর 'মানুষের ঠিকানা'। আমাদের এই সময়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন অরুণাভ চক্রবর্তী আর সুকন্যা সিংহ। প্রথমজনের দুই খণ্ডে লেখা 'মহাবিশ্বের বিস্ময়' আর দ্বিতীয়জনের 'মহাকর্ষের কথা' দুটি ভালো কাজ। একটা চমৎকার প্রয়াস দেখেছি জে ডি বার্নালের Science in History-র অনুবাদে---ইতিহাসে বিজ্ঞান। কাজটা যথেষ্টই দুরূহ আর সেই দুরূহ কাজটা করেছেন আশীষ লাহিড়ী। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা এ বঙ্গের থেকে কমকিছু হয়নি। বরং একটু বেশিই বোধ হয় হয়েছে। মোহাম্মদ আবদুল জব্বার-এর 'প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যা', ভবেশ রায়ের 'অন্তহীন মহাকাশের অপার রহস্য', দ্বিজেন শর্মার 'গাছের কথা ফুলের কথা', কাজী মোতাহার হোসেন-এর 'গণিতশাস্ত্রের ইতিহাস' আর 'আলোকবিজ্ঞান' নিঃসন্দেহে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতেও বাংলা বই রচিত হয়েছে। এমনকী জীবাণুতত্ত্ব (bacteriology), কীটতত্ত্ব (Entomology) এসব নিয়েও বই রচিত হয়েছে। একথা ঠিক যে এর কোনো-কোনোটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমের কথা ভেবে রচিত হয়েছে। তাতে লেখকদের কৃতিত্ব খাটো করা যায় না। একসময় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদও

বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিশ্ববিদ্যালয়-পাঠ্য যেসব বই ওই প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল তার অনেকগুলোই উন্নত মানের। কিন্তু সে উদ্যোগ কিছুদূর এগিয়ে থেমে যায়। তবু কিছু ভালো বই এখানেও যে প্রকাশিত হয়েছিল তা অস্বীকার করি কী করে?

## ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি

বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনার শুরু উনিশ শতকেই। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের সূচনায় প্রকাশিত হয় অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'মীর কাসিম', 'সিরাজউদ্দৌলা' ও 'রাণী ভবানী'-র মতো বই। বিংশ শতকে ইতিহাস রচনায় রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নীহাররঞ্জন রায়ের পাশাপাশি উল্লেখ করব অমলেশ ত্রিপাঠীর নাম। আপনাদের মনে হতে পারে কেন আচার্য যদুনাথ সরকারের নাম উল্লেখ করলাম না। আসলে যদুনাথের অধিকাংশ বই-ই ইংরেজিতে লেখা। আর আমরা বাংলা ভাষায় রচিত ইতিহাসের কথা বলছি। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালির ইতিহাস' সম্বন্ধে কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট হয় না। তাঁর 'কৃষ্টি কালচার সংস্কৃতি' নামের ছোট্ট বইটি মাপে ছোটো বটে, তবে তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বেশ বড়ো মাপের। ফিরে আসি অমলেশ ত্রিপাঠীর প্রসঙ্গে। তাঁর 'ইতিহাস ও ঐতিহাসিক' বইয়ে তত্ত্ব আর তথ্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন চমৎকারভাবে। আধুনিক ঐতিহাসিক ও প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ঐতিহাসিকদের ইতিহাস-ভাবনা এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে। তাঁর আরও দুটি উল্লেখযোগ্য বই 'স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' এবং 'ভারতের মুক্তিসংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব'।

অতুল সুরের 'বাংলা ও বাঙালীর বিবর্তন' বইটিকে উপেক্ষা করা যায় না। উপেক্ষা করা যায় না তাঁর লেখা কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসকে। ১৯৪৮-৪৯ এ প্রকাশিত নির্মলকুমার বসুর 'হিন্দুসমাজের গড়ন' নৃতত্ত্ববিদ্যার চর্চায় অবিস্মরণীয়। আপাতত তুলছি না তপন রায়চৌধুরী, সুমিত সরকার বা সব্যসাচী ভট্টাচার্যের নাম। এঁদেরও প্রধান সব রচনাই ইংরেজিতে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহও মূলত ইংরেজিতে লিখলেও তাঁর 'দয়া : রামমোহন রায় ও আমাদের আধুনিকতা' আর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত' নাতিস্ফীত বই বটে, তবে চিন্তার স্বচ্ছতা ও গভীরতা এদুটি বইকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে। দীপেশ চক্রবর্তীর 'ইতিহাসের জনজীবন ও অন্যান্য প্রবন্ধ' বইটিকে সম্প্রতিকালে রচিত একটি অতিবিশিষ্ট বই বলে মনে করি।

মনে পড়বে সত্তরের দশকের গোড়ার দিকে গৌতম ভদ্রের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় সাময়িকপত্রের চেহারা নিয়ে প্রকাশিত 'অন্য অর্থ'-র কথা। বলা যেতে পারে অর্থনৈতিক ইতিহাসই ছিল তার বিষয়। সেটি যাঁরা তখন দেখার বা পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের বলি, সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে 'অন্য অর্থ'-র অখণ্ড রূপ। বাংলায় অর্থনৈতিক ইতিহাসের চর্চা কোন উচ্চতায় উঠতে পারে 'অন্য অর্থ' তার প্রমাণ। গৌতম ভদ্রের কথা যখন উঠল তখন তাঁর লেখা 'মুঘল যুগে কৃষি, অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ' বইটির কথাও বলতে হয়। এই বইটি যখন ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়, তখন ঐতিহাসিক মহলে রীতিমতো আলোড়ন হয়েছিল।

এবারে সমাজবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা বলি। পার্থ চট্টোপাধ্যায় যতটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, তার চাইতে বেশি একজন কীর্তিমান সমাজবিজ্ঞানী। ইংরেজি লেখালিখির পাশাপাশি তিনি বাংলায়ও লিখেছেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাদি। তাঁর দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ 'জনপ্রতিনিধি' আর 'প্রজা ও তন্ত্র'। প্রথম বইয়ে আলোচিত হয়েছে ভারতে জনপ্রতিনিধিত্বের ইতিহাস, জাতি ও জনজাতি, লিবারাল রাষ্ট্রচিন্তার প্রসঙ্গ ইত্যাদি। 'প্রজা ও তন্ত্র' তাঁর আর একটি অতি মূল্যবান বই। নিম্নবর্গের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের নেশন, প্রজাতন্ত্রের সার কথা এই বইয়ের আলোচ্য বিষয়। এসব বই পড়লে বাংলা ভাষায় লেখালিখি নিয়ে হীনমন্যতা কেটে যায়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের নাম উল্লেখ না করলে আমাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যেতে বাধ্য। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে আছে 'রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা', 'সমাজ নিরীক্ষণ' ইত্যাদি। দুটি বই-ই লেখা হয়েছে স্বল্প সাবলীল গদ্যে।

শোভনলাল দত্ত গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। মার্কসবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানই মূলত তাঁর অধিকাংশ রচনার কেন্দ্রীয় বিষয়। তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য বই 'মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা' আর 'সমাজ মার্কসতত্ত্ব ও সমকাল'। মার্কসীয় রাষ্ট্রদর্শনের এক শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা তিনি। সমাজ রাষ্ট্র ও অর্থনীতি নিয়ে অতি গভীর আলোচনা পেয়েছি সৌরীন ভট্টাচার্যের কাছ থেকে তাঁর 'পদ্ধতির পাঁচালি', 'পাঠকের গরজ' প্রভৃতি বই মেধাবী আলোচনায় সমৃদ্ধ। জন রলস, হাবেরমাস প্রভৃতি চিন্তাবিদকে নিয়ে, কার্ল পপারকে নিয়ে, কল্যাণরাষ্ট্রের ভাবনা নিয়ে তাঁর নিবন্ধগুলো পাঠককে আলোকিত করে।

অর্থনীতির প্রসঙ্গে প্রথমেই বলব ভবতোষ দত্ত ও অশোক রুদ্রের কথা। বাংলায় উৎসাহী পাঠকদের জন্য অর্থনীতি-বিষয়ক পুস্তক রচনার প্রধান উদ্যোক্তা তাঁরাই। এছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ করব অমিয়কুমার বাগচী আর প্রণব বর্ধনের নাম। অমিয়কুমার বাগচী 'সংস্কৃতি সমাজ ও অর্থনীতি' বাংলায় অর্থনীতি বিষয়ে একটি শ্রেষ্ঠ বই। ত্রিস্তরীয় আলোচনায় সমৃদ্ধ তাঁর বইটি।

প্রণব বর্ধনের 'রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থা ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি' আসলে অক্সফোর্ডে রাধাকৃষ্ণণ স্মারক বক্তৃতার পরিমার্জিত রূপ। ছোট্ট বই। কিন্তু দারিদ্র, কৃষি-অর্থনীতি, আর্থিক-বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে তাঁর গভীর বিশ্লেষণ বাংলায় অর্থনীতিচর্চায় মূল্যবান সংযোজন।

## বিদেশি সাহিত্য পরিচয়

বাংলাভাষায় বিদ্যাচর্চার আর একটি দিক হল বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ ও বিদেশি সাহিত্যের পর্যালোচনা। বিদেশি সাহিত্য, বিশেষত পাশ্চাত্য সাহিত্য বাঙালি পাঠকের গোচরে আনার কাজটা চলছে অনেকদিন ধরে, বিশেষত অনুবাদের মাধ্যমে। তবে গত দুই-তিন দশকে কয়েকজন ধীমান লেখক পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়ে এবং সাহিত্যিকদের নিয়ে অতি উৎকৃষ্ট আলোচনা করেছেন। সেসব আলোচনা যেমন পাঠকের কৌতূহল মেটায়, তেমনি তাঁদের উদ্দীপিত করে। সত্তরের দশকে উৎপল দত্তের লেখা 'শেকসপিয়ারের সমাজচেতনা' বইটির কথা মনে পড়ছে। মনস্বী লেখক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের যেকোনো রচনাতেই আলোকবিচ্ছুরণ

থাকে, সুকান্ত চৌধুরীও তেমনই এক লেখক, স্বল্পপ্রসূ বটে, কিন্তু গভীরগামী তাঁর লেখা। স্বপন চক্রবর্তীর 'বাঙালির ইংরেজি সাহিত্যচর্চা' একটি অসামান্য গ্রন্থ। এই বইয়ে আছে, শেকসপিয়ারকে নিয়ে চমৎকার আলোচনা। আছে সাহিত্যতত্ত্বেরও উৎকৃষ্ট আলোচনা। যাঁরা রেনে ওয়েলেক ও অস্টিন ওয়ারেনের Theory of Literature পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয় বুঝবেন স্বপন চক্রবর্তীর আলোচনা কতদূর সমৃদ্ধ। চিন্ময় গুহ তো কত বছর ধরে ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে চলেছেন। অরুণ মিত্রের অসমাপ্ত কাজটা তিনিই সম্পন্ন করেছেন। তাঁর 'চিলেকোঠার উন্মাদিনী', 'ঘুমের দরজা ঠেলে' শুধু ফরাসি সাহিত্যই নয়, দরজা খুলে দিচ্ছে ইউরোপীয় সাহিত্যের। সুদীর্ঘকাল ধরে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদের মাধ্যমে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের উন্মোচন ঘটিয়ে চলেছেন সার্থকভাবে। চমৎকার বই সুদেষ্ণা চক্রবর্তীর 'ইউরোপীয় সাহিত্য : ধ্রুপদী ও আধুনিক'।

অরুণ মিত্রের সার্ত্র্ বা আরাগঁ, তরুণকুমার ঘটকের সেরভান্তেস, দেবব্রত চক্রবর্তীর গুন্টের গ্রাস আমাদের ভাষার সম্পদ। দূর প্রবাসে মিউনিখে বসে জার্মান সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করে চলেছেন বুদ্ধদেব চক্রবর্তী। এসব কি বিদ্যাচর্চা নয়? এঁদের লেখা পড়লে একবারও কি মনে হয়, বাংলা ভাষা বিদ্যাচর্চার উপযুক্ত বাহন হয়ে উঠতে পারেনি?

## ভাষাবিজ্ঞান

পদার্থবিদ্যা রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞান যেমন টেকনিক্যাল বিষয়, ভাষাবিজ্ঞানও তেমনই টেকনিক্যাল বিষয়, যদিও তা সর্বৈব গবেষণাগার-নির্ভর বিষয় নয়। আমরা লক্ষ করেছি, ভাষাবিজ্ঞান নিয়েও বাংলা ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ বই লেখা হচ্ছে। আমরা লক্ষ করেছি, পশ্চিমবঙ্গেই নয় শুধু, বাংলাদেশেও ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলায় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণামূলক বইপত্র লেখা হয়েছে। এও বলবার কথা যে, অনেক লেখকই বাংলা ভাষাকে সাবলীলভাবে প্রকাশ করেছেন। ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'। কিছু পরে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত'। তবে ভাষাতত্ত্ব নিয়ে প্রকৃত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত অনেক আগে, বিংশ শতকের একেবারে গোড়ায়। লেখক ছিলেন শ্রীনাথ সেন যিনি আজ প্রায় বিস্মৃত এক ভাষাতাত্ত্বিক। ষাটের দশকে প্রকাশিত হয় মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' নামে সেই অসামান্য গ্রন্থ। সেই প্রথম দেখা গেল phonetics-কে ধ্বনিবিজ্ঞান, আর phondogy-কে ধ্বনিতত্ত্ব বলা হল। বাংলাদেশের

মুনীর চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম, মনসুর মুসা, মনিরুজ্জামান, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, দানীউল হক, দীন মুহম্মদ বাংলা ভাষায় ভাষাবিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে সার্থক চর্চা করেছেন। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে হুমায়ুন আজাদ লিখেছেন 'বাক্যতত্ত্ব', রফিকুল ইসলাম লিখেছেন 'ভাষাতত্ত্ব' নামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বই।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা' কলেজপাঠ্য হলেও অতি উৎকৃষ্ট বই। পবিত্র সরকার বহুপ্রসূ ভাষাবিদ। বাংলায় ভাষাচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক তিনি। তাঁর 'গদ্যরীতি পদ্যরীতি', 'ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ', 'বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বহু অগ্রন্থিত প্রবন্ধে তিনি চমস্কি এবং সঞ্জননী-সংবর্তনী ব্যাকরণকে আমাদের গোচরে এনেছেন। প্রবাল দাশগুপ্ত, উদয়নারায়ণ সিংহ, উদয়কুমার চক্রবর্তী, শিশিরকুমার দাশ প্রমুখেরা বারবার প্রমাণ করেছেন বাংলায় ভাষাতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানের চর্চা দিব্যি করা যায়।

এমনকী, শৈলীবিজ্ঞানের আলোচনাও পিছিয়ে থাকেনি। অপূর্বকুমার রায়, অভিজিৎ মজুমদার, নবেন্দু সেন, পবিত্র সরকার প্রভৃতি ভাষাবিদদের নানা বইপত্রে ও নিবন্ধে কথাসাহিত্যের শৈলী ও কবিতার শৈলী নিয়ে বিদগ্ধ আলোচনা পাওয়া গেছে। পবিত্র সরকার তো এমনকী রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষাও বিশ্লেষণ করেছেন। সবিশেষ বিনয়ের সঙ্গে বলি, এই বর্তমান আলোচকও ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এবং ভাষা নিয়ে বাংলাতেই লিখেছেন।

## শেষ কথা

আমি এতক্ষণ যে-কথাটা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছি তা এই যে, শুধু সমাজবিজ্ঞান বা ইতিহাস-অর্থনীতিই নয়, বাংলা ভাষায় দিব্যি লেখা যায় দর্শন ভাষাবিজ্ঞান ও বিজ্ঞান নিয়েও। সব লেখকই যে শ্রেষ্ঠ গদ্যের নমুনা রেখেছেন তা নিশ্চয় বলব না। তা সম্ভবও নয়, দরকারই বা কী। ভাবপ্রকাশক সাবলীল গদ্য হলেই হল। যাঁরা পারেননি বা পারেন না তেমন লিখতে, তাঁদের বিষয়বোধের দুর্বলতা দায়ী কিংবা দুর্বল ভাষাবোধ। বাংলা ভাষাকে দায়ী করা অন্যায় এবং ভুল। আমি বিশ্বাস করি, এমন কোনো বিষয় নেই যা আমাদের মাতৃভাষায় সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের ভাষারও নিশ্চয় এখনও উন্নয়নের সুযোগ আছে। যাকে ভাষা-পরিচর্যা বলে তার দরকার নিশ্চয় আছে। বানান নিয়ে আরও ভাবা যায়, দরকার আরও পরিভাষা রচনার, বাক্যকে নানাভাবে ব্যবহার করার এবং সমস্তরকম ভাব ও ভাবনার প্রকাশ আরও সুষ্ঠুভাবে করার পথ খোঁজার দরকার আছে নিশ্চয়। ইংরেজির মতো ভাষার প্রয়োগকৌশল নিয়ে সাহেব ভাষাবিদরা নিরন্তর ভেবে চলেছেন। আমরাই বা কেন ভাবব না। তাই বলে এই ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার উপযুক্ত মাধ্যম বা বাহন হতেই পারে না, এই হীনমন্যতায় আক্রান্ত হব না। কাউকে ভাষা নিয়ে অতিপ্রগল্‌ভ হতে বলি না, আবার হীনমন্যতার বোধও যে অন্যায়, সেকথাও জোর দিতে বলতে চাই।

উল্লেখপঞ্জি

১. বসু ২০০২

২. রায় ২০০৭

৩. ঠাকুর ১৯৬৯ : ৭৮-৭৯

৪. ঠাকুর, তদেব তত্রত্য

৫. ভট্টাচার্য ২০০০ : ৫৩

৬. মিত্র ১৩৭১

৭. চক্রবর্তী ২০০০

৮. চট্টোপাধ্যায় ১৩৭১ : ৩৭৩

৯. সরকার ১৩৮৮

১০. মিত্র ২০১২ : ৭৮

১১. দত্ত ১৩৮৮

১২. দত্ত, তদেব তত্রত্য

১৩. চট্টোপাধ্যায় ২০১৩

## গ্রন্থপঞ্জি

ক. প্রকাশিত গ্রন্থ

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৯৬৯। বাংলাভাষা-পরিচয়। বিশ্বভারতী। ভট্টাচার্য, সুভাষ। ২০০০। বাঙালির ভাষা। আনন্দ পাবলিশার্স।

রায়, শিবনারায়ণ। ২০০৭। প্রবন্ধ সংগ্রহ। আনন্দ পাবলিশার্স।

খ. পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধাবলি

দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। ১৩৮৮। 'বাঙলা গদ্যের স্বভাবধর্ম', বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা। অরুণকুমার বসু সম্পাদিত, সমতট।

মিত্র, প্রেমেন্দ্র। জ্যৈষ্ঠ ১৩৭১। দেশ।

সরকার, পবিত্র। ১৩৮৮। 'বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন', বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা। অরুণকুমার বসু সম্পাদিত, সমতট।

গ. সম্পাদিত গ্রন্থ

চক্রবর্তী, সুধীর। ২০০০। বুদ্ধিজীবীর নোটবই। ধ্রুবপদ।

বসু, প্রদীপ। ২০০২ 'জ্ঞাননচর্চার ভাষা', সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। বাঙালির ভাষাচিন্তা।

ঘ. রচনাবলি

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। ১৩৭১। বঙ্কিম রচনাবলী। সাহিত্য সংসদ। দ্বিতীয় খণ্ড।

# ACKNOWLEDGEMENT

Prof. Anindyajyoti Majumdar
Professor of International Relations
Jadavpur University, Kolkata 700032
Dr. Baisakhi Mitra
Head of the Department and Senior Assistant Professor
Department of Museology
Rabindra Bharati University
Kolkata 700007
Dr. Binoda Kumar Mishra
Director
Centre for Studies in International Relations and Development (CSIRD)
P-16, Scheme-XM, C.I.T Road, Beliaghata, Kolkata- 700010
West Bengal, INDIA
Dr. Debasis Kumar Mondal
Senior Assistant Professor, Department of Anthropology,
University of Calcutta,
35, Ballygunge Circular Road, Calcutta 700019.
Prof. Mahidas Bhattacharya
Professor of Linguistics
Former Director & Head, School of Languages and Linguistics
Jadavpur University, Kolkata 700032
Prof. Malabika Dasgupta
Department of Economics
Tripura University, Agartala, Tripura
Prof. Pallab Sengupta
Former Vidyasagar Professor, Rabindra Bharati University
Former President, The Asiatic Society, Kolkata
Prof. Partha Pratim Basu
Professor of International Relations
Jadavpur University, Kolkata 700032
Dr. Queen Bala Marak
Department of Anthropology
North-Eastern Hill University, Shillong 793022

Meghalaya, IND
Prof. Rupendra Chattopadhyay
'Paresh Chandra Chatterjee Professor of History',
Department of History, Presidency University
& Professor (on lien), Department of Archaeology, University of Calcutta
Dr. Saumitra Basu
Principal Investigator/Research Associate
Indian National Science Academy, New Delhi
Dr. Shyamsundar Bhattacharya
Former Senior Research Officer (L) and Head, Language Division,
D/D the Registrar General, India, Govt. of India, Kolkata.
Philological Secretary, The Asiatic Society